ফ্রুটিং ব্যাগে ঝিনাইদহে কলা চাষে নতুন সম্ভাবনা

ঝিনাইদহে প্রচুর পরিমাণে কলা উৎপাদিত হয়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে জেলায় কলার আবাদ হয় ৫ হাজার ১০ হেক্টর জমিতে। অন্যান্য আবাদের চেয়ে কলা চাষে কৃষকদের কম পরিশ্রম করতে হয়। ঝড় ও কীটপতঙ্গের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হলে কলা একটি লাভজনক আবাদ।

শীতকালে কলার কাধীতে মশা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ বেশি আক্রমণ করে। ফলে কলার গায়ে স্পট তৈরি হয়, পাকলেও কলার মধ্যে শক্ত হয়ে থাকে। কীট পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করতে নিয়মিত কীটনাশক স্প্রে করতে হয়। যেটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সম্প্রতি ঝিনাইদহে রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ) ও কেমোনিক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামের দুটি এনজিও’র সহায়তায় নিরাপদ কলা আবাদ শুরু হয়েছে। ঝিনাইদহ সদর, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, যশোর সদর ও চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার এক হাজার কৃষককে নিরাপদ কলা চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে উন্নতমানের টিস্যুকালচার চারা। বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে ১০ হাজার ফ্রুটিং ব্যাগ। কলাকে কীট-পতঙ্গ ও মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে কীটনাশকের পরিবর্তে ফ্রুট ব্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের কৃষক নন্দ দুলাল কবিরাজ এনজিও দুটির সহায়তায় প্রায় দুইবিঘা জমিতে কলার আবাদ করেছেন। তার ক্ষেতে গিয়ে দেখা যায় কাধী আসা কলাতে ফ্রুট ব্যাগ পরানো হয়েছে। তিনি বলেন, ফ্রুট ব্যাগ ব্যবহারের ফলে মশা ও কীটনাশকের আক্রমণ থেকে কলা রক্ষায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে না। কলা এমনিতেই একটি স্বাস্থ্যকর খাবার। তারপরেও এই কলা আরও নিরাপদ। দেশের বিভিন্ন সুপারশপেও এই কলার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

নন্দ দুলাল কবিরাজকে দেখে একই গ্রামের পরিমল কবিরাজও কলায় ফ্রুট ব্যাগ ব্যবহার করছেন। তিনি বলেন, এই পদ্ধতিতে খরচ কম ও মানসম্পন্ন কলা উৎপাদন করা সহজ। কলাচাষী শরিফুল ইসলাম বলেন, আরআরএফ থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কলার ফ্রুট ব্যাগ পেয়ে, বর্তমানে আগের তুলনায় বেশি লাভবান হচ্ছি।

প্রকল্পের ফোকাল পার্সন কৃষিবিদ ড. অসিত বরণ মন্ডল বলেন, নিরাপদ

কলা উৎপাদন ও বিপণন সম্পর্কিত প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা কলাচাষি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছি যার মাধ্যমে টিস্যু কালচারের চারার ব্যবহার, সুষম সার প্রয়োগ, কলার ফ্রুটিং ব্যাগ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে এবং কলাচাষিরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবে এবং মান সম্মত কলা ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ নূর এ নবী বলেন, ব্রিটল পোকার আক্রমণ, মশার আক্রমণ ও বাতাশে বিভিন্ন জীবানু থাকে সেটা কলার সাথে মিশে কলা নষ্ট হয়ে যায়। যেকারণে কৃষক কীটনাশক স্প্রে করে। সেক্ষেত্রে ফ্রুটিং ব্যাগ ব্যবহার করলে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষাসহ কীটনাশক ব্যবহার করা লাগে না। ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য নিরাপদ কলা উৎপাদিত হয়। বাজারে নিরাপদ কলার প্রচুর চাহিদা রয়েছে। চাষিরা এই পদ্ধতিতে চাষ করলে বেশি লাভবান হবে।

কলা চাষে লক্ষ টাকা আয়ের আশা সোনা মিয়ার

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ছোটশলুয়া গ্রামের কলা চাষী সোনা মিয়া ৩ বিঘা জমিতে চাপা জাতের কলা চাষ করে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা আয়ের আশা করছেন।

উদ্যোক্তা সোনা মিয়া বলেন, আমি পড়াশোনা করেছি কিন্তু বাবার সাথে ছোট বেলা থেকেই মাঠে আসা। কৃষক পরিবারের সন্তান আমি। কৃষি কাজ দেখতে দেখতে একরকমের ভালবাসা তৈরি হয়ে গেছে । আমি আমার ৩ বিঘা জমিতে চাপা জাতের কলা চাষ করেছি, এছাড়া আমার পেয়ারা বাগান, পেঁপে বাগান, ভুট্টা ও অন্যান্য চাষ রয়েছে।

চাপা জাতের কলা চাষ করেছি এর কারণ এই জাতের কলায় রোগ বালাই খুবই কম। কারণ এর আগে আমি বগুড়ার শবরি জাতের কলা চাষ করেছিলাম কিন্তু পানামা রোগের কারণে লোকসান হয়েছিল। চাপা কলার রোগবালাই কম এবং দুই থেকে তিনবার ফল নেওয়া যায়। কারণ এই জাতের কলা গাছ রোপণ করলে এর আশেপাশে দিয়ে অটোমেটিক চারা তৈরি হয়। চাপা জাতের কলায়

পরিচর্যা খরচ কম হওয়ার বিঘা প্রতি ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ করলেই প্রায় ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব বাজার দর ভালো থাকলে।

গাছ রোপণ সম্পর্কে জানায়, এই জাতের গাছ ৪/৫ হাত দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করতে হবে এবং চারা রোপণের সময় জৈবসার, বরুণ এবং দানাদার বিষ গর্তে দিতে হবে। রোপণের পর মাঝে মাঝে এসে বাগানের আগাছা পরিস্কার করার পাশাপাশি সেচ দিতে হবে। একটু যত্ন নিলেই অধিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব বলে আমি আশা করছি।

দর্শনায় সাদা ৫ জাতের পেয়ারায় স্বপ্ন দেখছেন ওমর ফারুক

চাকরির পিছনে না ছুটে কৃষি কাজকে ভালোবেসে লেখাপড়ার পাশাপাশি বারোমাসি সাদা ৫ জাতের পেয়ারায় স্বপ্ন দেখছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা নাস্তিপুর গ্রামের তরুণ উদ্যেক্তা ওমর ফারুক। শখের বসে ১০ কাটা জমিতে দুইশত পেয়ারার চারা রোপণ করে সফলতা পাওয়ার পাশাপাশি নিজেকে সাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলেছেন তরুণ এই উদ্যোক্তা।

ওমর ফারুক বলেন পেয়ারার অন্যান্য অনেক জাত থাকলেও সাদা ৫ জাতের পেয়ারায় ফলন বেশি পাওয়া যায় এবং স্বাদও বেশি। বারোমাস গাছে পেয়ারা থাকায় এর চাহিদা বেশি, পাশাপাশি বাজার মূল্য ভালো পাওয়া যায়। আমার পেয়ারা বাগানের বয়স এখন দুই বছর। শুরুতে বাগান তৈরিতে চারা কেনা, জমি প্রস্তুত করা, সার, ঔষধ ইত্যাদি কিনতে আমার প্রায় ১ লক্ষ টাকা মতো খরচ হয়েছিল। বাগান শুরুর ৭ মাস পর থেকে আমি পেয়ারা বিক্রি করি। সাদা ৫ জাতের পেয়ারায় রোগ বালাই কম দেখা যায়। রোগ বালাই বলতে ছত্রাক দেখা যায় এবং গাছের ডাল পঁচা রোগ দেখা যায় এক্ষেত্রে ওষুধ দিলেই এর সমাধান করা যায়। পেয়ারার একটু পরিচর্যা করলেই অধিক ফলন ও মুনাফা পাওয়া যায়।

উদ্যেক্তা ওমর ফারুক আরও বলেন আমার বাবা কৃষি কাজ করে, আমি কৃষক পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই কৃষি কাজ ভালো লাগে। আমি পড়াশোনা করেছি কৃষি বিষয় নিয়ে, এতে করে আমার অনেক সুবিধা হচ্ছে

চাষ করতে। চাকরির প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই আমি কৃষি কাজ নিয়েই থাকবো। আমি মেহেরপুর প্রতিদিন কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই আমার গল্প তুলে ধরার জন্য। কারন আমার এই বাগান দেখে অনেক তরুণ কৃষি কাজে আগ্রহ দেখাবে।

ইউটিউব দেখে চায়না কমলা চাষে বাজিমাত রাজা মিয়ার

ইউটিউব দেখে শখের বসে চায়না কমলার বাগান করে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা নাস্তিপুর গ্রামের উদ্যেক্তা রাজা মিয়া। থোকায় থোকায় চায়না কমলার ফলনে হাসি ফুটেছে রাজা মিয়ার মুখে।

উদ্যেক্তা রাজা মিয়া বলেন, আমার ১ বিঘা জমিতে ১০০ টি চায়না কমলার চারা রোপণ করেছিলাম । এখন বাগানের বয়স ৫ বছর। রোপণের প্রথম বছরে অল্প কিছু ফল আসে । দ্বিতীয় বছরে প্রথম বারের থেকে একটু ফলন বেশি হলেও তৃতীয় বছরে পরিপূর্ণ ভাবে চায়না কমলার গাছে ফল আসা শুরু হয়।

বিঘা প্রতি খরচের বিষয়ে জানতে চাইলে রাজা মিয়া বলেন, প্রথমে খরচ একটু বেশি হয়েছে কারন জমির চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিতে হয়েছে, চারা কেনা , জমি চাষ ও অন্যন্য খরচ দিয়ে আমার প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা মতো খরচ হয়েছিল। চায়না কমলা চাষ করেছি কারণ চায়না কমলার রোগ বালাই কম, কয়েকটি রোগ দেখা গেলেও ঔষধ এর মাধ্যমে তা সমাধান করা যায়। আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে এটি মানিয়ে নিয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে ।

পরিচর্যার বিষয়ে তিনি বলেন, চায়না কমলার একটু দেখাশোনা করলেই অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। তবে খেয়াল রাখতে হবে জমিতে পানি না জমে। কারণ গাছের গোড়ায় পানি জমলে গাছ মারা যেতে পারে এবং গাছে ফল থাকলে ঝরে যেতে পারে। জমির আগাছা সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে, সেই সাথে জৈব সার দিতে হবে। কথায় আছে”যত্ন নিলে রত্ন মিলে” সুতরাং একটু যত্ন নিলে চায়না কমলার ফলন বেশি পাওয়া যাবে।

উদ্যেক্তা রাজা মিয়া আরও বলেন চায়না কমলার বাগান নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি কারণ, শুরুতে ইউটিউব ও শখের বসে চয়না কমলার বাগান শুরু করে আল্লাহর রহমতে আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। নিজের বাগানের গাছে থোকায় থোকায় চায়না কমলা দেখে আনন্দে মন ভরে যায়।

বীজ সিন্ডিকেটের কবলে হারিয়ে যাচ্ছে ‘হরিধান’ চাষ

ঝিনাইদহ তথা সারা বাংলাদেশের মধ্যে আলোচিত ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী জাতের নাম “হরিধান” একটি ব্র্যান্ড ।

হরিধান নিঃসন্তান হরিপদ কাপালীর সন্তান। বিশ্বের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীর নামের পাশে জাত কৃষক হরিপদ কাপালীর নাম উঠেছে। পাঠ্যসুচিতে উঠে এসেছে হরিপদ কাপালীর “হরিধান” আবিস্কারের তথ্য। অথচ সেই হরি ধান আজ বীজ সিন্ডিকেটের কবলে পড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। অধিক ফলনশীল ও খরা সহিষ্ণু এই ধান এখন আর কৃষকের উন্মাদনার কারণ হয় না। হরিধান নিয়ে তারা আর ভাবে না। তাদের মাথায় কেবলই বিদেশী বীজ কোম্পানীর উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষের ভাবনা। কৃষকের এই ভাবনা থেকে সময়ের ব্যবধানে হরি ধান মাঠ থেকে হারিয়ে গেছে। এখন আর মাঠে মাঠে দেখা মেলে না হরি ধানের সোনালী ক্ষোত।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, হরিধানের চাল মোটা হলেও ভাত সুস্বাদু। এই ধানের গাছ পুষ্ট ও লম্বা হওয়ায় বিচালির দাম অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি। এছাড়া কম সারে অধিক ফলন। এতো গুন বা বৈশিষ্ট্য থাকার পরও ঝিনাইদহ জেলাতে হরি ধান চাষ সম্প্রসারন করা যায়নি। হরি ধানের উদ্ভাবক প্রয়াত কৃষক হরিপদ কাপালি জেলা পর্যায়ের নানা পুরস্কার পেলেও এখনো জাত হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি পায়নি হরিধান। এদিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা রতনপুর, মধুহাটি, মামুনশিয়া ও ধোপাবিলা গ্রামে কিছু কৃষক হরি ধান চাষ করছেন। তবে এই ধানের আবাদ সম্প্রসারিত না হওয়ার কারণে হরি ধান ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। কৃষক শরিফুল ইসলাম জানান, বিদেশী বীজ কোম্পানীর বাজার নিয়ন্ত্রনের কারনে সিন্ডিকেটের সাথে পাল্লা দিয়ে বাজারে টিকতে

পারেনি হরি ধান। যার ফলে আমাদের এলাকার উদ্ভাবিত হরি ধানের বীজ হারানোর পথে।

হরিপদ কাপালীর পালিত পুত্র রূপকুমার জানান, হরি ধানের জাতটি বীজকেন্দ্রীক বাজারজাতের কৌশলের কাছে টিকতে পারেনি। উচ্চফলনশীল জাতটি সুকৌশলে একটি মহল বাজার থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। প্রথম দিকে এ ধানে কোনো রোগবালাই ধরেনি। কিন্তু জমিতে একই ফসল বারবার চাষ করলে উৎপাদন কমে যায়। সে কারণেই হয়তো কৃষকরা হরি ধান তেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এ বিষয়ে হরি হরিপদ কাপলীর উদ্ভাবনা নিয়ে প্রথম সংবাদ প্রচারকারী সিনিয়র সাংবাদিক আসিফ কাজল জানান, যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক লোকসমাজ পত্রিকায় প্রথম এই খবরটি প্রকাশ হলে দেশে হৈচৈ পড়ে যায়। এরপর দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ^ মিডিয়া লুফে নেয় হরিপদ কাপালীর উদ্ভাবনার খবরটি। তিনি আরো জানান, কৃষকের মাঝে হরি ধান চাষ প্রায় হারিয়ে গেছে। তার কারন হলো বর্তমান কৃষকদের প্রলুব্ধ করা হচ্ছে বিদেশী হাইব্রিড জাতের ধান বীজের প্রতি। এ কারণে এখন আর কেউ হরি ধান চাষ করছেন না। ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি অফিসার নূরে-নবী জানান, আমি এখানে এসে নিজে কখনো হরি ধান দেখি নাই। তবে পত্র-পত্রিকা মারফত জেনেছি। বর্তমানে যদি এই ধান চাষে কৃষক লাভবান হয় এবং সরকারী ভাবে এর সংরক্ষণ ও সম্প্রসারন করা হয় তাহলে অবশ্যই আমরা এগিয়ে নিবো। এ বিষয়ে কৃষকরা শতভাগ সহয়তা পাবেন।

উল্লেখ্য ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সুধাহাটি ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের জাত কৃষক প্রয়াত হরিপদ কাপালি দুই দশক আগে উদ্ভাবন করেন হরি ধান। এই ধান উদ্ভাবনের পর দেশব্যাপী খবরটি ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

কুষ্টিয়ায় প্রথমবারের মতো সুপারফুড ‘চিয়া বীজ’ চাষ

প্রথমবারের মতো কুষ্টিয়া কুমারখালীতে চাষ হচ্ছে সুপারফুড চিয়া বীজ। উপজেলার জগন্নাথপুর মাঠে ১০ শতাংশ জমিতে চিয়া বীজ চাষ

করেছেন মহিউদ্দিন নামে এক কৃষক। আশানুরূপ ফলনের প্রত্যাশা করছেন তিনি।

জগন্নাথপুর মাঠে বিস্তীর্ণ জমিতে গাঢ় সবুজ রঙের গাছ দুলছে। প্রতিটি গাছ লম্বায় প্রায় তিন ফুট। গাছে বেগুনি রঙের ফুল এসেছে। এসেছে গুটি গুটি ফলও। এর নাম ‘চিয়া বীজ’।

চিয়া সিড পুষ্টিকর খাবার। এতে আছে দুধের চেয়ে ৫ গুণ বেশি ক্যালসিয়াম, কমলার চেয়ে ৭ গুণ বেশি ভিটামিন সি, পালং শাকের চেয়ে ৩ গুণ বেশি আয়রন, কলার চেয়ে দ্বিগুণ পটাশিয়াম, মুরগির ডিম থেকে ৩ গুণ বেশি প্রোটিন, স্যামন মাছের চেয়ে ৮ গুণ বেশি ওমেগা-৩। পুষ্টিকর এই খাবারটি সপ্তাহের সাত দিনই খাওয়া যায়। তবে ৩-৪ দিন খেলেও শরীরে উপকারে আসে।

উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক মহিউদ্দিন আহমেদ জানান, কৃষি বিভাগের পরামর্শে তিনি এই নতুন ফসল ১০ শতাংশ জমিতে চাষ করেছেন। কৃষি বিভাগ বীজ সরবরাহ করেছে এবং চাষ পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে।

কৃষক রা’ বলেন, এর আগে এই ফসল কোনোদিন দেখিনি। কৃষি বিভাগ থেকে জেনেছি, এই ফসল মানব শরীরের জন্য খুবই উপকারী। বাজারে এই ফসলের মূল্য অনেক বেশি। ভালো ফলন ও বাজার সুবিধা পেলে আগামীতে আরও বেশি জমিতে এই ফসল চাষ করবে বলেন স্থানীয় কৃষকরা।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, চিয়া বীজ মধ্য আমেরিকার একটি উদ্ভিদ। পুদিনার একটি প্রজাতি। বিভিন্ন পোষক পদার্থের উপস্থিতির জন্য এটিকে সুপারফুড বলা হয়। প্রতি বিঘা জমিতে চিয়া বীজ উৎপাদন করতে খরচ হয় ১২-১৫ হাজার টাকা। বীজ উৎপাদন হয় ৭০-৮০ কেজি। প্রতি কেজি বীজ বিক্রি হয় ৭০০-১০০০ টাকা দরে। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চিয়া বীজ বপন করতে হয়। ফলন ঘরে তোলা যায় মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। চিয়া বীজ উৎপাদনে জৈবসারের ব্যবহার বেশি করতে হয়।

বিভিন্ন গবেষণার সূত্র উল্লেখ করে কৃষি বিভাগ জানায়, শর্করা, ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাসসহ একাধিক খনিজ পদার্থ রয়েছে চিয়া বীজে। এ ছাড়া, একাধিক ভিটামিন ও প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট রয়েছে চিয়া বীজে। রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডও। ফলে শরীরে পাচনতন্ত্র ও মেটাবলিজমের জন্য অত্যন্ত উপকারী চিয়া বীজ। চিয়া বীজে ফাইবারের পরিমাণ থাকে অনেক। প্রয়োজনীয় ফাইবার পাওয়া যায় এই বীজ থেকে। ফাইবারের প্রাধান্যের

কারণে হজম প্রক্রিয়া ভালো থাকে।

চিয়া বীজ পাচন প্রক্রিয়া ঠিক রাখায় কমতে পারে ওজনও। এ ছাড়াও, শরীরে অতিরিক্ত চর্বি কমাতেও সহায়ক। চিয়া বীজ খেলে শরীরে কোলেস্টেরলের সমস্যা কমে। রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এই বীজ।

ফল বা দইয়ের মতো বিভিন্ন ধরনের খাবারের সঙ্গে খেতে হয় এই বীজ। পানিতে ভিজিয়ে রেখেও খাওয়া যায়। শরবতে ব্যবহার করা যায়। লেবুর রসের সঙ্গে বা দুগ্ধজাত পদার্থের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায়।

কৃষক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানতাম যে, চিয়া বীজ অনেক পুষ্টিকর খাদ্য। পরীক্ষামূলক ভাবে ১০ শতাংশ জমিতে এবার চিয়া বীজ চাষ করছি । প্রথমে যশোর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে চিয়া বীজ পেয়ে এই চাষ শুরু করি । আশানুরূপ ফলন পেলে অবশ্যই আরো বেশি জমিতে চাষ করবো। চিয়া চাষ অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় এই চাষে দিন দিন কৃষকরা আগ্রহ হবে বলে মনে করেন তিনি।

উপজেলা উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, কুমারখালীতে এই প্রথম চিয়া বীজ এর চাষ হচ্ছে উপজেলার জগন্নাথপুর মাঠে। এই চাষটি খুব লাভজনক হওয়ায় আমরা কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছি যাতে তারা চাষটি বৃদ্ধি করে।

কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ দেবাশীষ কুমার দাস বলেন, ‘চিয়া বীজ খেলে মানবদেহের শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়ে। এ বীজ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে। সেই সঙ্গে ওজন কমানো, সুগার স্বাভাবিক রাখা, হাড়ের ক্ষয়রোধ করে। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণ ফাইবারসমৃদ্ধ চিয়া পেট পরিষ্কার রাখে ফলে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকিও কমায়। উপজেলা কৃষি অফিস সব সময় কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। এই চাষ আরো বাড়বে বলে আশা করেন তিনি। সব ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা করে যাচ্ছে কৃষি অফিস।